ভোরের কাগজ

তারিখ 31 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশ্নের ধরন জানার দরকার নেই

কিছুদিন আগে একটি দৈনিকে এইচএসসির নতুন ইংরেজি প্রসঙ্গে শীর্ষক একটি চিঠি ছাপা হয়। চিঠির লেখক সিলেট জেলার ঐতিহ্যবাহী মুরারী চাঁদ (এমসি) কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী দীপঙ্কর দাস। এই ধরনের চিঠি এটাই প্রথম নয়, কারণ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে যতোটা উৎসাহী তার থেকে বেশি উৎসাহী বেশি নম্বর পাওয়ার কৌশল আয়ত্ত করতে। স্নেহভাজন দীপঙ্কর দাস ভালো ফল প্রত্যাশী। পত্রিকান্তরে তাকে সিলেবাস পুরোটা ভালোমতো আয়ত্ত করে ভালো ফল লাভের আশীর্বাদ ব্যক্ত করে এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

আমি ১৯৭৭ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করে পারিবারিক কারণে কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজে (গাজীপুর) ভর্তি হই এবং ১৯৭৯ সালে ওই কলেজ থেকে মাত্র ৫৩০ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাস করি। বেশি নম্বর না পাওয়ার মূল কারণটি (দোষ?) ছিল এই, আমি কয়েক বছরের প্রশ্ন ঘাঁটাঘাঁটি না করে এবং কমন প্রশ্ন খোঁজার চেয়ে সিলেবাস পড়তেই বেশি আগ্রহী ছিলাম।

দুর্ভাগ্যজনক কারণে অনার্সের পরিবর্তে আমাকে পাসকোর্সে পড়তে হয়েছিল, তাও আবার জগন্নাথ কলেজে। ওখানে ১৯৮১ সালের পরীক্ষায় (যখন দেদারছে নকল হয়েছিল) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে আমি ফেল ডিভিশনে পাস করেছিলাম। পরের বছর (১৯৮২) সামরিক শাসনের অধীনে ৫০০-এর অধিক বিএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমরা মাত্র ২০ জন পাস করেছিলাম, ফলাফল একেবারে যতোটা খারাপ হতে পারে, ততোটাই হয়েছিল। কিন্তু পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয়ে মাস্টার্স প্রথম পর্বের বাংলে দ্বিতীয় স্থান লাভ করি এবং শেষপর্বে কীটতত্ত্বে থিসিসসহ মাস্টার্স পড়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। বছর দুই সরকারি স্কুলে চাকরি করাকালে খণ্ডকালীন এমএড পড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। ওই পড়া শেষ না হতেই ত্রয়োদশ বিসিএস পরীক্ষার ফল বের হয়। এতে আমি আমার বিষয়ে প্রথম হয়ে যাই। পরে থিসিস শেষ করে এমএড-এ আমি প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করি।

এরপর বছর ছয়েক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরসহ কলেজে জীববিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে (শিক্ষাদান করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান নেই বলে) প্রায় বছর চারেক অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অনুরূপ আলোচনার পর ২০০২ সালের মে মাস থেকে বর্তমান কর্মস্থলে 'বিশেষজ্ঞ' (সহকারী অধ্যাপক) পদে কর্মরত আছি।

আমি নিশ্চয়ই দাবি করবো না যে, আমি খুব বড়ো চাকরি পেয়ে গেছি বা উন্নতি করে ফেলেছি (বরং এখনো হেজিপেজিই রয়ে গেছি!)। কিন্তু দেখার বিষয় হলো, প্রশ্ন কমন ফেলে পরীক্ষার খুব বেশি নম্বর না পেলেও চলে। কোনো শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করে দেয় তার পুরোটা আয়ত্ত করাই শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি। যে ওই সিলেবাসের যতো শতকরা আয়ত্তে আনতে পারবে (পাঠোত্তর বিশ্লেষণসহ) সে ততো শতকরা নম্বরই প্রাপ্য। শুধু পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন করাই অনৈতিক নয়, বরং কম শিখে প্রশ্ন ঘাঁটাঘাঁটি করে কমন ফেলে বেশি নম্বর পাওয়াকেও আমি অনৈতিক মনে করি।

কথা সত্য, এই প্রশ্ন ঘাঁটাঘাঁটি আর কমন ফেলে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া যে শুধু শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা, তা নয়, অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকগণও এরূপ প্রত্যাশা করেন। কোচিং সেন্টারগুলো যতোটা না শিক্ষা দেয়, তার চেয়ে বেশি পারদর্শিতা দেখায় এই কমন ধরা আর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের জন্য ওই কমন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে দেওয়ার মধ্যে। মূলত এই দুটো পারদর্শিতাই এই ব্যবসা-কেন্দ্রগুলোর ব্যবসায় পসার ও প্রসারের প্রধান কারণ।

মজার ব্যাপার হলো, শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারীরা কমন ধরার কাজে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। কিভাবে? তাই বলছি। সিলেবাসেই উল্লেখ থাকে তার কোন অংশ থেকে কতোটা কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এবং কিভাবে কয়টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, শিক্ষার্থীরা সিলেবাসের অর্ধেকেরও কম পড়ে অনায়াসে সব প্রশ্নের উত্তর করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের আগে থেকে প্রশ্ন সম্পর্কে তথা শিক্ষামূল্যায়ন সম্পর্কে এতো তথ্য জানা প্রকৃত শিক্ষার পথে এক ধরনের অন্তরায়।

অথচ দীপঙ্কর দাস বলছে যে, সে তাদের ইংরেজি বিষয়ের নতুন সিলেবাস পড়ার পর কিভাবে এবং কি ধরনের প্রশ্ন আসবে তা জানতে পারছে না বলে হয়তো পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। সে কিন্তু সিলেবাসের অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ের কোনো সমস্যার কথা বলছে না। এটি আসলেই কোনো শিক্ষণ-শিখন সমস্যা নয়।

বেশি নম্বর প্রাপ্তির এই ধরনের প্রত্যাশাই যে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি চাওয়া এবং অনৈতিক সে চিন্তাটা সবার মাথায় ঢোকা উচিত। ১৯৮৯ সাল (আমার বিএড পড়ার বছর) থেকে আমার মাথায় এই চিন্তাটা ঢুকেছে। যতোই বিষয়টা নিয়ে ভাবছি, ততোই এই মতটি শক্তিশালী হচ্ছে যে- শিক্ষার্থীদের আগে থেকে প্রশ্নের ধারা সম্পর্কে এতো কিছু জানা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যবিরোধী। শিক্ষামূল্যায়ন মূল্যায়ক প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক ও শিক্ষকদের কাজ। তাদের কাজে নাক না গলিয়ে শিক্ষার্থীদের উচিত সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই দাবি করতে পারে, পরীক্ষায় আসা সব প্রশ্নই যেন সিলেবাসের ভিতর থেকে হয় অথবা ওই সিলেবাস পড়ে চিন্তা করে উত্তর দেওয়া যায়। তাছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নে (বিশেষত গণিতে) যেন ছাপার ভুল না থাকে, কারণ এ ধরনের ভুল পরীক্ষার্থীদের অনেক সময় বিপাকে ফেলে।

আর প্রশ্নপত্রে যে উত্তরদানের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশ্নের চেয়ে ৪০-১০০% বেশি প্রশ্ন থাকে তাও শিক্ষার জন্য প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পরীক্ষার্থীদের বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়ার জন্য! এরূপ বেশি প্রশ্ন থাকার ফল দাঁড়ায় এই যে, বিভিন্ন প্রশ্নের ধরনের পার্থক্যের কারণেই মূল্যায়নে বেশ হেরফের হয়ে যায়। একজন কম জানা পরীক্ষার্থীও প্রশ্ন নির্বাচনের কারণে অন্যদের চেয়ে বেশি নম্বর পেতে পারে।

আমরা যদি বেশি নম্বরই দিতে চাইবো, তবে অনেক বিষয়ে পরীক্ষার্থী যতো ভালোই লিখুক না কেন ১০ থেকে ৭ এর বেশি বা ২০ থেকে ১৩/১৪-এর বেশি নম্বর দিতে চাই না। কম শিখিয়ে বেশি নম্বর দেওয়ার উপযুক্ত এতো আয়োজনের পর আমরা এতো কৃপণ হই কেন? নম্বর তো পরীক্ষকের বাপ-দাদার সম্পত্তি নয়! আবার কম শিখে বেশি নম্বর দাবি করা বা পেয়ে যাওয়াও পরীক্ষার্থীর অধিকারের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং আশা করি, শিক্ষাক্রম প্রণেতা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী পর্যন্ত সবাই বিষয়গুলো খেয়াল করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

❑ আবদুস সাত্তার মোল্লা